টাংগুয়ার হাওড়ে

সবুজ-সাথীর প্রকৃতি পাঠ

IUCN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

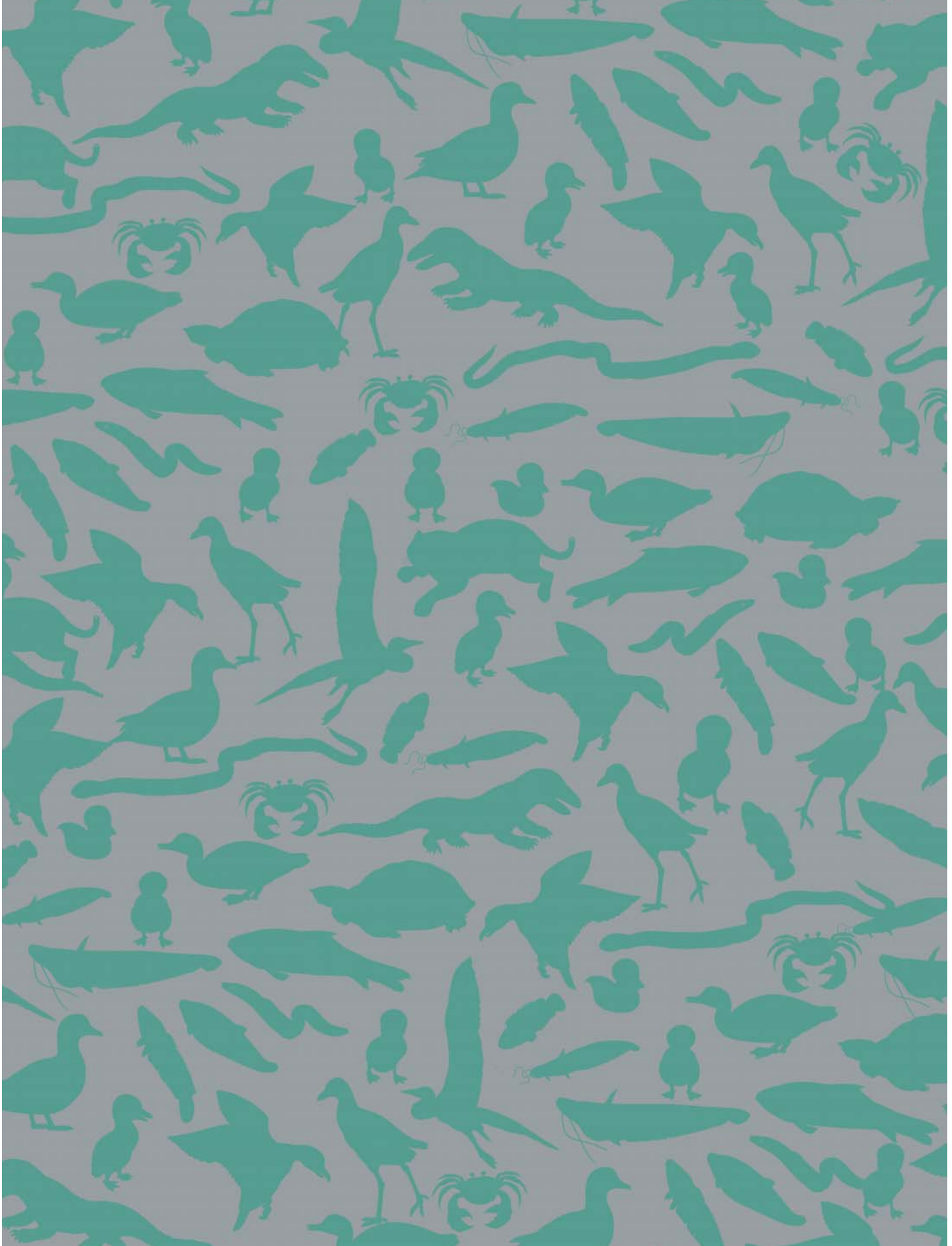

টাংগুয়ার হাওড়ে

সবুজ-সাথীর প্রকৃতি পাঠ

প্রকাশক
আইইউসিএন বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস

প্রকাশকাল
জুন ২০১৩

মুদ্রণ
নিমফিয়া
স্বজন টাওয়ার (২য় তলা)
৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ
প্রকল্প কার্যালয়
টাংগুয়ার হাওড় সমাজভিত্তিক
টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
আইইউসিএন বাংলাদেশ
১৬২ সুরমা আবাসিক এলাকা
ষোলঘর, সুনামগঞ্জ
ফোন: +৮৮০৮৭১৬১৬৫৫

প্রধান কার্যালয়
আইইউসিএন
বাড়ি ১৬, রোড ২/৩
বনানী, ঢাকা ১২১৩

ISBN- 978-984-33-773-6

সহযোগিতায়
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড
কোঅপারেশন (এসডিসি)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

রচনা ও পরিকল্পনা
এ বি এম সারোয়ার আলম

সম্পাদনা
ধ্রুব এষ
মোঃ আমিনুর রহমান
সাঈদ মাহমুদ রিয়াদ

অংকন ও অঙ্গসজ্জা
মামুন হোসাইন

সহযোগিতায়
মোঃ আবির আহমেদ
আনোয়ারা বেগম শেলী
জোবায়দুর রহমান সোয়েব
শেখ আসাদুজ্জামান

সার্বিক ব্যবস্থাপনা
ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ
ড. ইসতিয়াক সোবহান

টা ং গু য়া র হা ও ড়

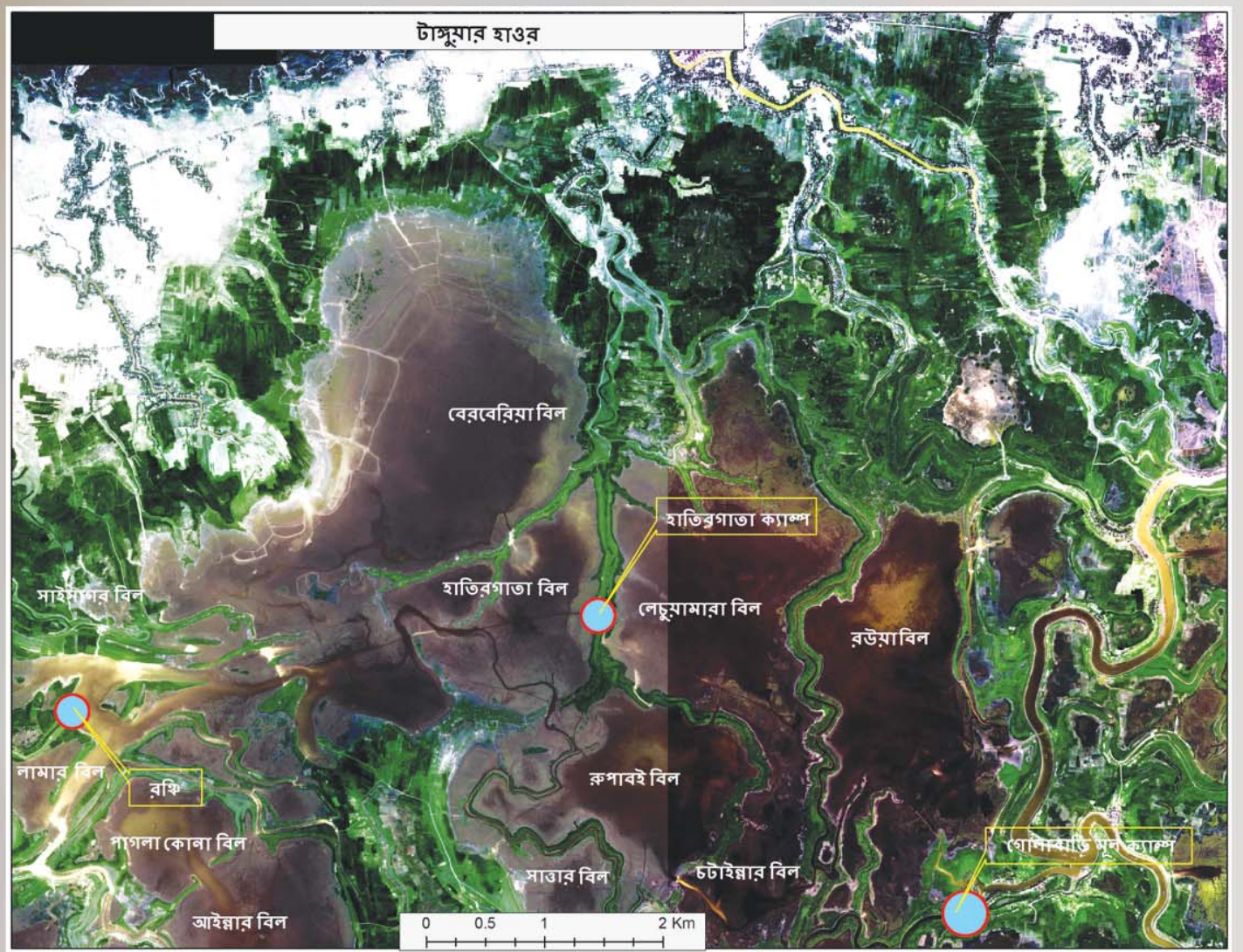
টাঙ্গুয়ার হাওর
বেরবেরিয়া বিল
হাতিরগাতা ক্যাম্প
হাতিরগাতা বিল
লেচুয়ামারা বিল
রউয়া বিল
সাইমাগর বিল
লামার বিল
রঞ্চি
রুপাবই বিল
পাগলা কোনা বিল
সাত্তার বিল
চটাইল্লার বিল
আইল্লার বিল
0 0.5 1 2 Km

সবুজ আর সাথী ভাই বোন। টাংগুয়া হাওড়ের ইন্দ্রপুর গ্রামে তাদের বাড়ি। বাড়ির উঠান থেকে টাংগুয়া হাওড়ের প্রায় সবটুকু দেখা যায়। মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল জলরাশির এই হাওড়।

টাংগুয়ার হাওড় নিয়ে সবুজ আর সাথী ছোট বেলা থেকেই অনেক গল্প শুনেছে। হাওড়ে মোট বিলের সংখ্যা ৫৪টি। প্রতিটি বিলের এক বা একাধিক কান্দা আছে। হাওড়ের প্রবেশমুখে ২টি নদী আছে, এটিও তারা জানে। হাওড়ে সাথী কখনও না গেলেও সবুজ বেশ কয়েকবার গিয়েছে।

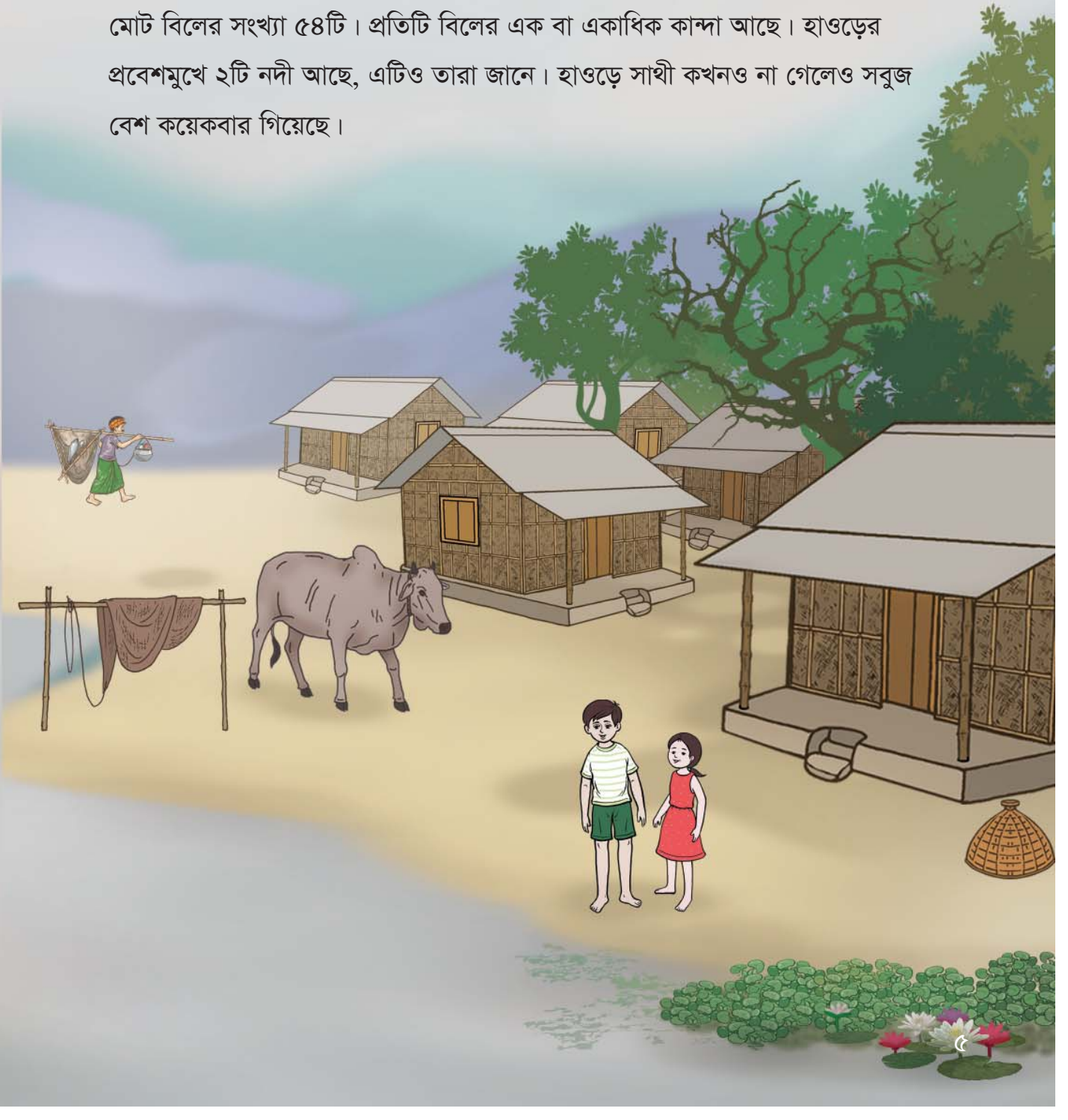

একদিন সবুজ বলল, ‘চলো সাথী হাওড়ে যাই। হাওড়ে কত রকমের গাছপালা আছে, জানো? আর পানির উপর লাল-নীল ও সাদা শাপলা ভেসে থাকে। যে সিংড়া ফল আমরা শীতকালে তুলে খাই তাও আছে। আমরা হাওড় দেখব আর তুমি শাপলা-শালুক আর সিংড়া ফল তুলবে।

সাথী একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। তারা হাওড় দেখতে যাবে। ইন্দ্রপুর গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে তারা হাওড়ের হাতিরগাতা বিলে পৌঁছলো।

দু'জনে মিলে যখন হাঁটু পানিতে নেমে শাপলা ও সিংড়া ফল সংগ্রহ করছে, ঠিক তখন হঠাৎ একটি হাঁস পাখিকে তারা কারেন্ট জালে আটকে থাকতে দেখলো। পাখিটি বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে। সাথী বলল, 'ইস্! পাখিটার কী কষ্ট হচ্ছে।'
ভাইবোন মিলে পাখিটাকে জাল থেকে মুক্ত করে ছেড়ে দিল।

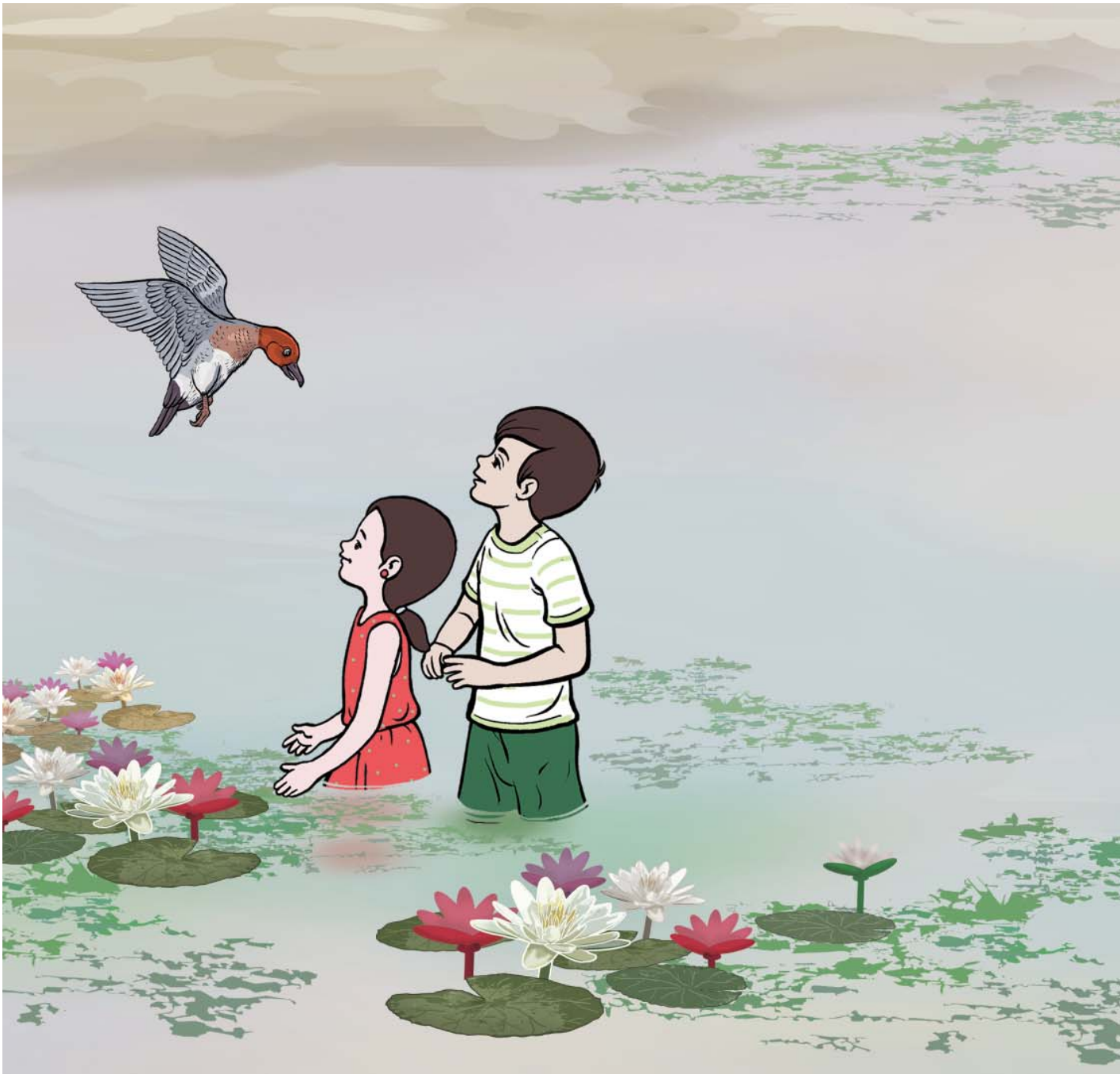

পাখিটি বলল, ‘তোমরা খুব ভালো। আমাদের বসবাসের জন্য এই হাওড়টি খুবই উপযোগী জায়গা। তাই আমরা শীতকালে তোমাদের দেশে ছুটে আসি। কিন্তু তোমাদের দেশের কিছু কিছু মানুষ আছে জানো, যারা আমাদের ফাঁদ ও জাল পেতে ধরে নিয়ে যায়, তাঁদের হাত থেকে তোমরা আমাদের রক্ষা করো বন্ধুরা।’

পাখিটার কথা শুনে খুব মায়া হলো সবুজ আর সাথীর। সবুজ বলল, 'জানো সাথী, এই হাওড়ে শীতকালে হাজার হাজার পাখি আসে। সবচেয়ে বেশি আসে বিভিন্ন জাতের হাঁসপাখি। দাদুর কাছে শুনেছি। কয়েকটি হাঁসপাখি আমি চিনি। এগুলো হলো লেঞ্জাহাঁস, ভূতিহাঁস, মেটে হাঁস, মৌভলী হাঁস, পিয়ং হাঁস ও শরালী। এছাড়াও এখানে দেখা যায় পানকৌড়ি, কালেম, গয়ার, বগ, দলপিপি, জলমুরগি, গাংচিলসহ হরেক রকমের ছোট-বড় পাখি।'

সাথী জিজ্ঞেস করলো, ‘এই পাখিরা খায় কী?’

সবুজ বলল, ‘হাওড়ে অনেক ধরনের জলজ উদ্ভিদ আছে, বেশিরভাগ পাখিই জলজ উদ্ভিদ খায়। তবে কিছু কিছু পাখি আছে যারা শামুক, পোকামাকড় ও মাছ খায়। প্রতিদিন এই পাখিগুলো কী পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ খায়, জানো? প্রায় কয়েক মণ।’

কথা বলতে বলতে হাতিরগাতা বিল থেকে লেচুয়ামারা বিলের মুখে এল সবুজ আর সাথী। কান্দার উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা তাঁদের দাদুকে দেখতে পেল। দাদু নৌকা চড়ে গারোজাল দিয়ে মাছ ধরছেন। দূর থেকে সাথী ডাক দিল, 'দাদু'।

দাদু পাড়ে নৌকা ভেড়ালেন। দাদুর নৌকাতে উঠে ভাইবোন বিলের মাঝপথে চললো।

সাথী দাদুকে জিজ্ঞেস করলো, ‘দাদু তুমি কী মাছ ধরো?’

দাদু বললেন, ‘এই তো দাদু, আমি হাওড়ের রুই বোয়ালসহ বড় বড় মাছ ধরি।’

সবুজ বলল, ‘এই হাওড়ে আর কী কী মাছ পাওয়া যায় দাদু?’

দাদু বললেন, ‘এই হাওড়ে প্রায় ১৪১ জাতের মাছ পাওয়া যায়। এইগুলোর মধ্যে রুই, কাতল, বোয়াল, শোল, গজার, আইড়, ফলি এবং গইন্না মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। জানো তো, মহাশোল ও চিতল এর মতো দুর্লভ মাছও আছে এই হাওড়ে। এখানে প্রায় সব মাছ ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটায়।’

সাথী জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি ছোট মাছ ধরো না কেন দাদু?’

দাদু বললেন, ছোট মাছ ধরার জন্য অন্য জাল লাগে, দাদু। যুগ যুগ ধরেই আমরা ডাইট্টা বড়শি, বুরচুঙ্গা চাই, লার বড়শি, গারোজাল, চৌহুন্দাজাল দিয়ে মাছ ধরে আসছি। বড় মাছ ধরার জন্য গারোজাল ও চৌহুন্দাজাল ব্যবহার করি।’

দাদুর নৌকা চলছে। দেখা গেল, সামনে একটা বারকি নৌকার ফ্যানে জাল আটকে গেছে। সবুজ বলল, 'এটা কি জাল দাদু? জালে ছোট-বড় সব ধরণের মাছ ধরা পড়েছে।'

দাদু বললেন, এটাই সর্বনাশা কারেন্ট জাল। যেদিন থেকে এই জাল হাওড়ে নামলো সেদিন থেকেই হাওড়ের মাছের বিনাশ শুরু, দাদু। এরা নির্বিচারে মাছ ধরে তাদের বড় হতে দেয় না। কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা বেআইনী। বুঝেছ?'

সবুজ বলল, 'তাহলে তোমরা সবাই কারেন্ট জাল ব্যবহারকারীদের নিষেধ করো না কেন?'

দাদু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওরা চুরি করে মাছ ধরে, দাদু। আর এটা তো তোমরা জানো যে, চুরি করা অন্যায় এবং অপরাধ। এজন্যে ওরা প্রায়ই ধরা পড়ে ও শাস্তি পায়।'

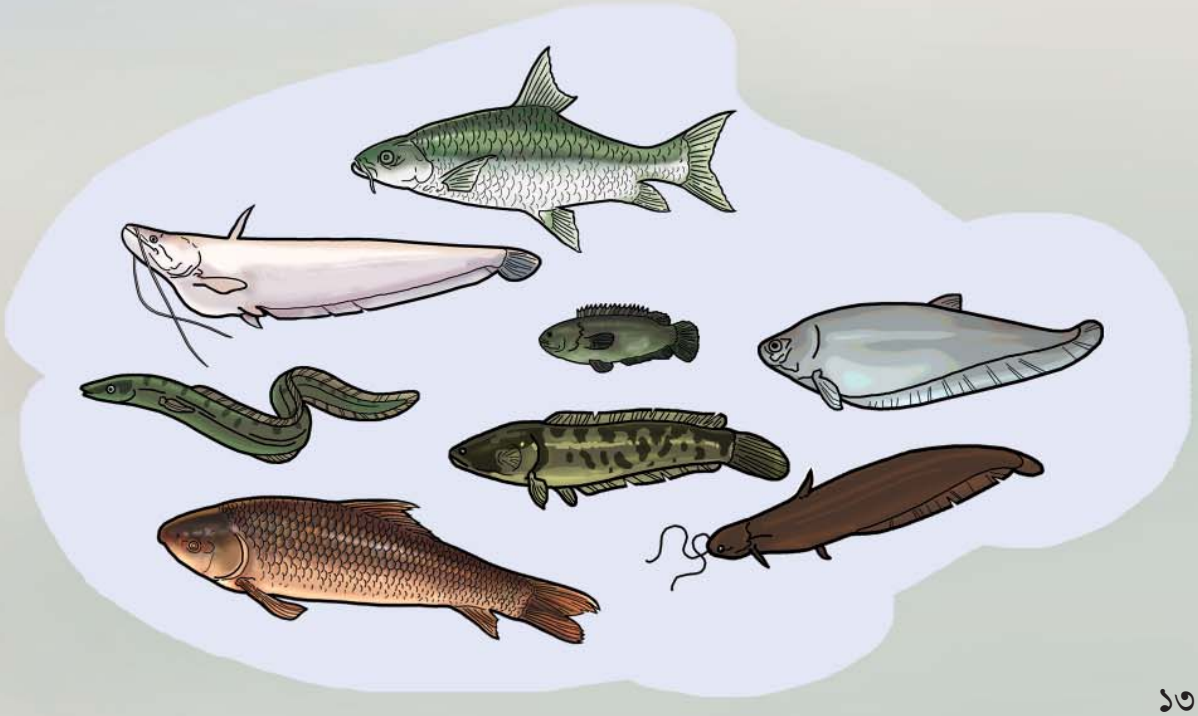

লেচুয়ামারা বিল থেকে রূপাভূই বিলে ঢোকার মুখে একটা বড়োসড়ো কান্দা পড়লো। শীতের হালকা রোদে কান্দায় একটা বিরাট কচ্ছপ রোদ পোহাচ্ছিল।

সাথী বলল, 'দেখ, দেখ, কত বড় কচ্ছপ।'

দাদু বললেন, 'এই হাওড়ে ৬ জাতের কচ্ছপ দেখা যায়। কচ্ছপগুলোর নাম হলো ধুম কাছিম, সন্ধি কাছিম, কড়ি কাইট্টা, কালো কাছিম, হলদে কাইট্টা ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ধুম কাছিম। এরা এই হাওড়ে ডিম দেয় ও বাচ্চা ফোটায় এবং হাওড়ের ময়লা, বর্জ্য খেয়ে পানি পরিষ্কার রাখে। জেলেদের জালে কচ্ছপ অহরহ আটকা পড়ে এবং মারা যায়। কিছু মানুষ আবার কচ্ছপের মাংস খায়। ফলে দিন দিন কচ্ছপের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সবুজ বলল, ‘দাদু দাদু ঐ দেখ লোকগুলো একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওরে বাবারে পুলিশ নাকি!’

দাদু বললেন, ‘ভয় পেও না, দাদু, ওরা আনসার ও কমিউনিটি গার্ডের লোক। ওরা হলো হাওড়ের পাহারাদার। কারেন্ট জাল ব্যবহারকারীকে ধরেছে। আজ আর রক্ষা নেই ওদের। বলেছিলাম না মাছ চোররা একদিন শাস্তি পাবেই।’

সাথী জিজ্ঞেস করলো, ‘দাদু, আনসার ও কমিউনিটি গার্ডরা কি শুধু মাছ চোরদের ধরে?’

দাদু বললেন, ‘না ওরা হাওড়ের সব ধরনের সম্পদ যেমন, হিজল, করচ, নল, খাগড়া, চাইল্যা, বইল্যা, ইকরগাছ ইত্যাদির বন কেউ ধ্বংস করলে তাঁকে ধরে। তাছাড়া কেউ বন্যপ্রাণীর ক্ষতি করলে বা পাখি শিকার করলে তাঁকেও ধরে।’

সবুজ জিজ্ঞেস করল, ‘এই বিলটার নাম কী, দাদু?’

দাদু বললেন, ‘রূপাভূই, বিলের তলার মাটি দেখতে রূপার মতো বলেই এর নাম হয়েছে রূপাভূই।’

সাথী জিজ্ঞেস করল, ‘বিলের মাঝখানে খুঁটি পুঁতে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন, দাদু?’

দাদু বললেন, ‘ও, এই বিলটা হলো মাছের জন্য অভয়াশ্রম।’

সাথী জিজ্ঞেস করল, ‘অভয়াশ্রম কী, দাদু?’

দাদু বললেন, ‘মাছরা নিরাপদে যে বিলে থাকতে পারে, দাদু। যে বিলের মাছ কেউ ধরে না। এরকম আরও চারটি অভয়াশ্রম আছে টাংগুয়ায়। এগুলো হলো রউয়া, তেকুইন্যা, আলমেরদুয়ার ও বালুয়ারডুবা। এসব আভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষেধ।’ দাদু আরো বললেন, ‘পাখির জন্যও এরকম অভয়াশ্রম আছে। টাংগুয়ার বেরবেরিয়া ও লেচুয়ামারা বিলকে এর মধ্যে পাখিদের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।’

গল্প করতে করতে এর মধ্যে তাঁরা অনেক দূর এসে পড়েছে। সামনে চটাইন্যার কান্দা। সবুজ সাথী নৌকা থেকে নেমে নলবনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলো। দাদু আবার মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চটাইন্যার কান্দায় কয়েকজন রাখাল গরু চরাচ্ছে। তাঁদের একজন চাঁইয়ের ভেতর করে মেটে হাঁসের বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো দেখতে পোষা হাঁসের বাচ্চার মতন।

সবুজ বলল, 'এই বাচ্চাগুলো কোথায় পেয়েছো?'

ছেলেটি বলল, 'আমরা হাঁসের বাসা থেকে নিয়েছি।'

বাচ্চাগুলোর মা-বাবা তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে ওড়াউড়ি করছে। তা দেখে খুব মায়া হলো সবুজ এবং সাথীর। তারা রাখাল ছেলেটিকে বলল, 'বাচ্চাগুলো ছেড়ে দাও ভাই। এগুলো ধরা অন্যায়। দেখছ না, ওদের মা-বাবা কাঁদছে !'

রাখাল তাদের কথা শুনে বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিল। তাদের মা-বাবা ওড়াউড়ি বাদ দিয়ে খুশিতে বাচ্চাদের জাপটে ধরল এবং নলবনের দিকে চলে গেল।

সবুজ আর সাথী এবার চটাইন্যার কান্দা থেকে চলে এল বাগমারায়। এটা একটু উঁচু জায়গা। বাগমারার পাশ দিয়ে ছোট একটা খাল চলে গেছে। একটা সরু বাঁধ দিয়ে হাওড়কে ঐ খালটা আলাদা করেছে। খালের ধারে সারি সারি করচ গাছ। এই হিজল-করচ হলো টাংগুয়ার প্রাণ। বহু জাতের পাখি এসব গাছে রাত কাটায়। এখান থেকেই টাংগুয়ার হাওড়ে সূর্যাস্ত দেখল সবুজ আর সাথী।

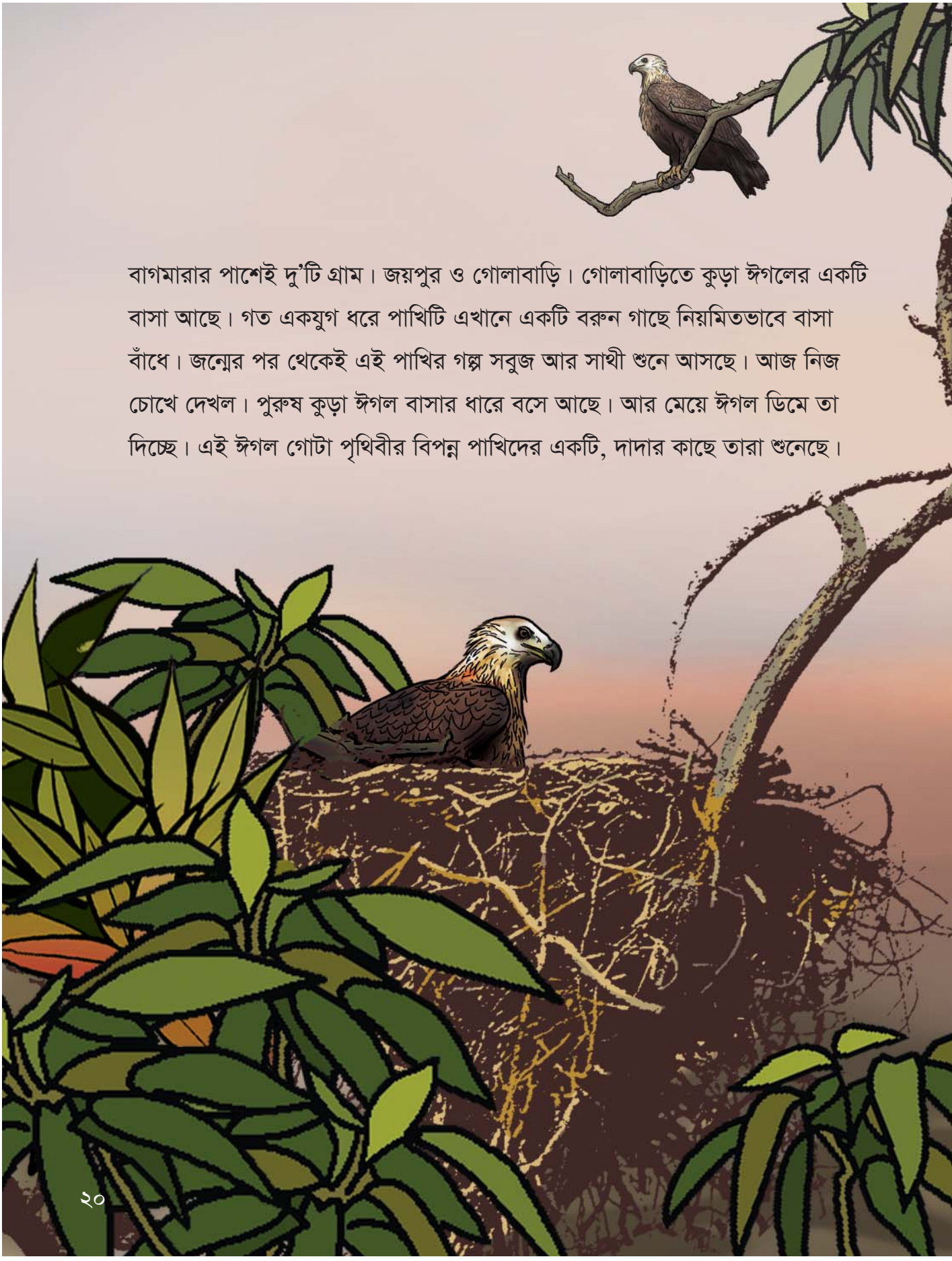

বাগমারার পাশেই দু'টি গ্রাম। জয়পুর ও গোলাবাড়ি। গোলাবাড়িতে কুড়া ঈগলের একটি বাসা আছে। গত একযুগ ধরে পাখিটি এখানে একটি বরুন গাছে নিয়মিতভাবে বাসা বাঁধে। জন্মের পর থেকেই এই পাখির গল্প সবুজ আর সাথী শুনে আসছে। আজ নিজ চোখে দেখল। পুরুষ কুড়া ঈগল বাসার ধারে বসে আছে। আর মেয়ে ঈগল ডিমে তা দিচ্ছে। এই ঈগল গোটা পৃথিবীর বিপন্ন পাখিদের একটি, দাদার কাছে তারা শুনেছে।

আঁধার নেমে আসছে। সবুজ আর সাথী এখন নজরখালি বাঁধের উপর। এই মেঠো পথে হাঁটা এখন বেশ কঠিন। বাড়ি ফেরার পথে বড় একটি করচ বাগান পার হতে হবে। খানিকটা পথ তারা পেরুলো। হঠাৎ করেই একটি মেছো বাঘ তাদের সামনে দিয়ে লাফিয়ে হাওড়ের দিকে চলে গেল। সাথী ভয়ে সবুজকে জড়িয়ে ধরল। এই এলাকায় মেছো বাঘ আছে এটা তাঁরা জানত। একবার এলাকার মানুষ একটি মেছো বাঘকে পিটিয়ে মেরেছিল। তারপর বন বিভাগ থেকে লোক এসে সবাইকে বলেছিল, মেছো বাঘ হাওড়ের খুব উপকারী বন্ধু। তাদের হত্যা বন্যপ্রাণী আইনে নিষেধ আছে। আজ নিজের চোখে মেছো বাঘের মতো বিরল প্রাণীকে দেখতে পেল সবুজ আর সাথী। দেখে তাঁদের খুব আনন্দ হলো।

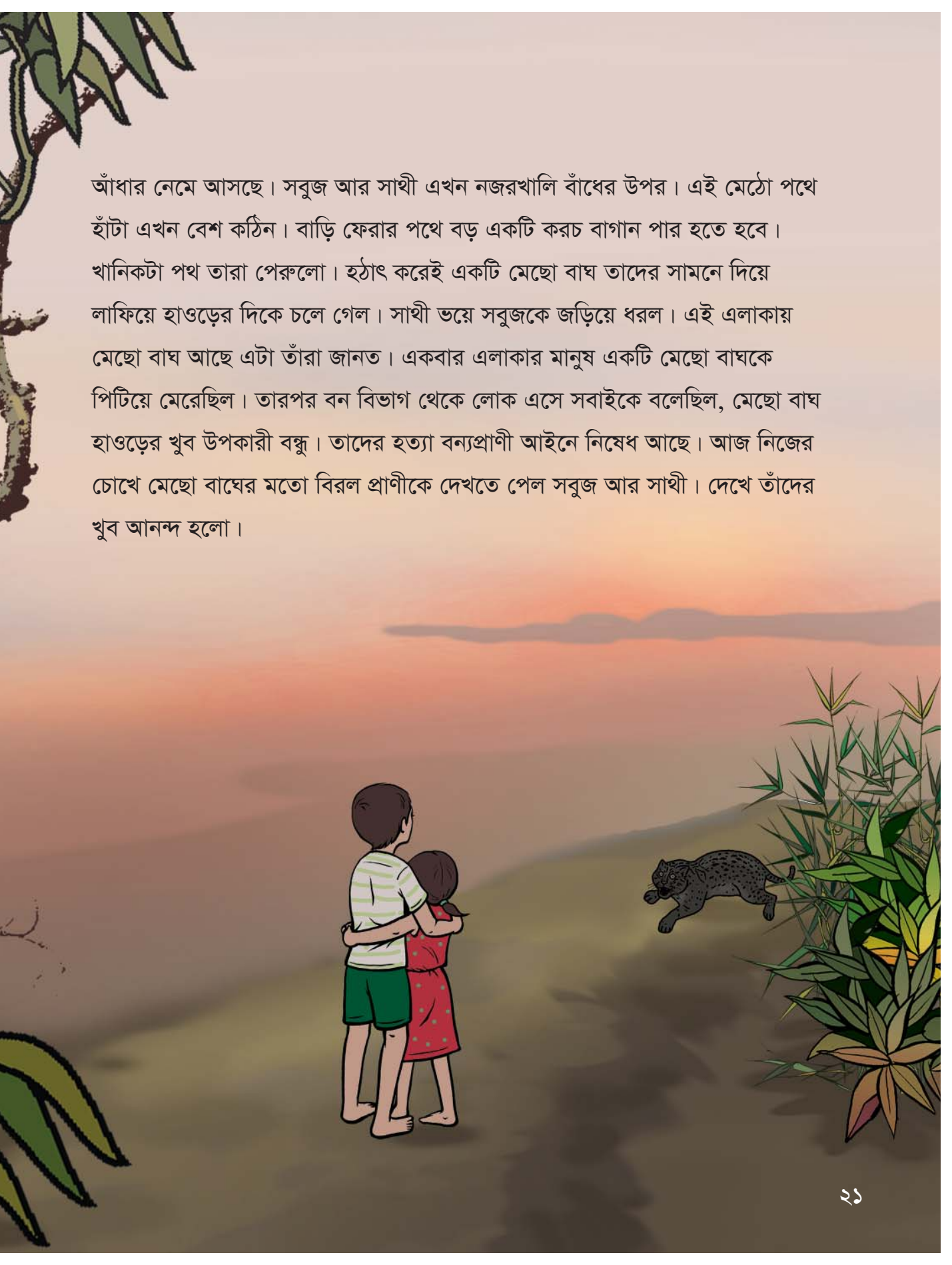

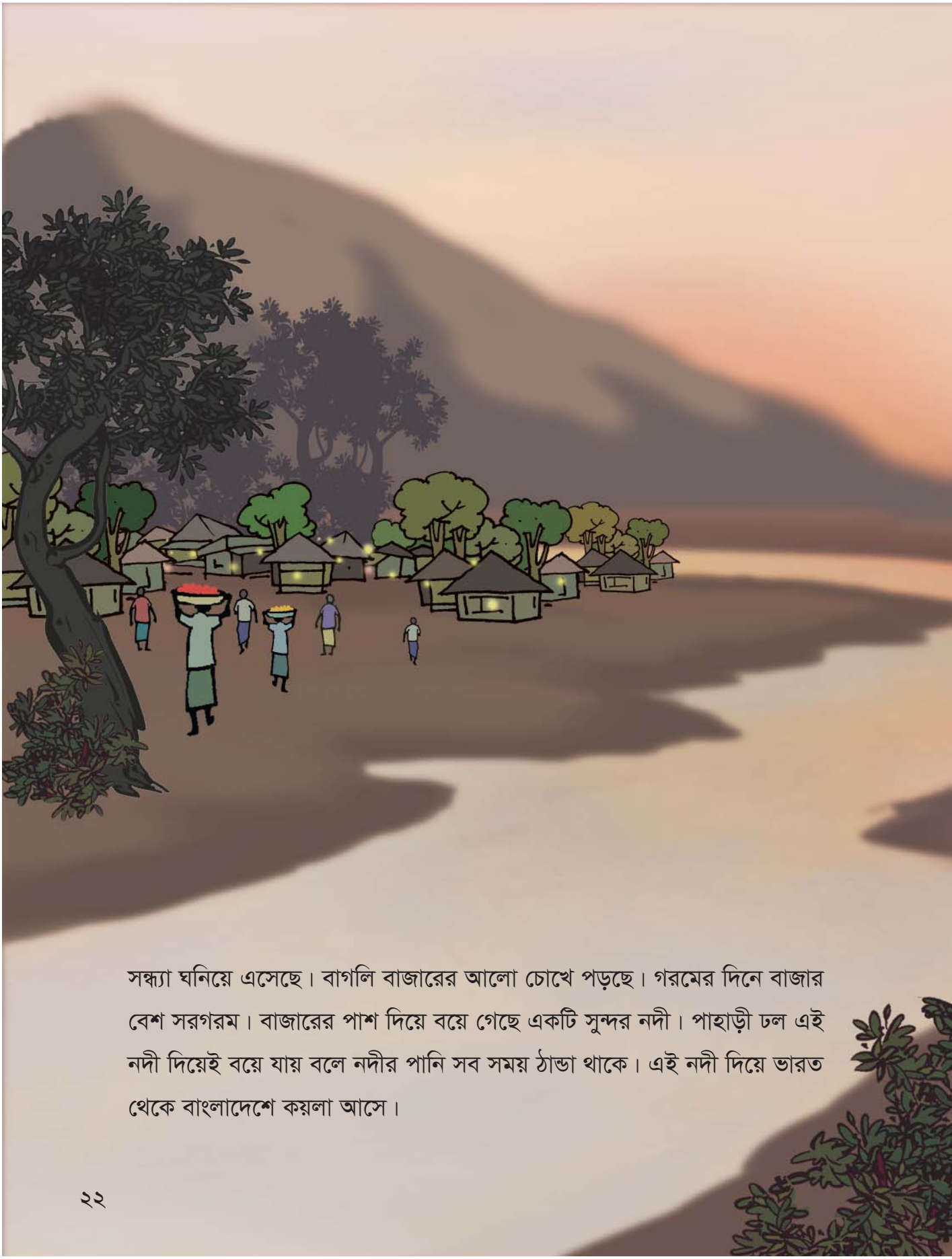

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাগলি বাজারের আলো চোখে পড়ছে। গরমের দিনে বাজার বেশ সরগরম। বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি সুন্দর নদী। পাহাড়ী ঢল এই নদী দিয়েই বয়ে যায় বলে নদীর পানি সব সময় ঠান্ডা থাকে। এই নদী দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে কয়লা আসে।

সবুজ আর সাথী তাঁদের গ্রামের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখান থেকে পায়ে হাঁটার পথ বেশ সরু। সেই পথে তাঁরা দেখলো, গাঁয়ের একদল মানুষ একটি দাঁড়াশ সাপকে পিটিয়ে মারার চেষ্টা করছে। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁদের নিষেধ করলেন এবং বললেন যে এই সাপগুলোর বেশিরভাগই যে নির্বিষ এটা সাধারণ মানুষ জানে না। সবাই মনে করে দাঁড়াশ সাপের বিষ আছে। আসলে সাপটির কোন বিষদাঁতই নেই। এরা কৃষকের খুবই উপকারী বন্ধু। প্রতিদিন পাকা ধান ক্ষেতের ইঁদুর খেয়ে নিভৃতে কৃষকের উপকার করে। আর এই সাপটিকে দেখলেই মানুষ পিটিয়ে মারে। সবুজ, সাথীর মায়া হলো সাপের জন্য। প্রতিজ্ঞা করলো যে, এই নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে হবে।

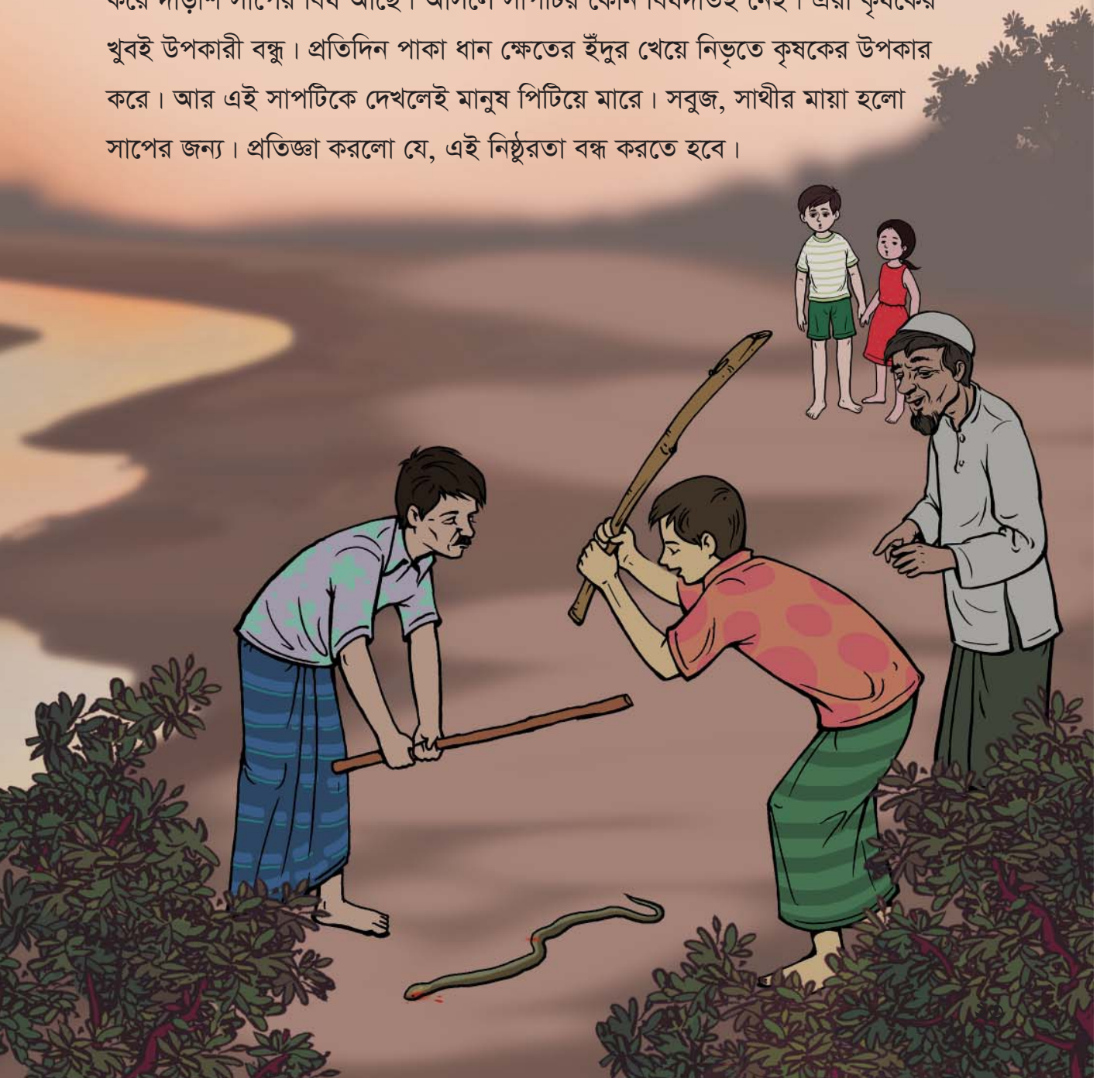

সবুজ সাথীদের বাড়িতে একটি চাপকল আছে। তাদের পাড়ায় ঐ একটিই খাবার পানির কল। একসময় এ এলাকার অনেক মানুষ হাওড়ের পানি পান করতো। এখনও অনেকে পান করে। সবুজদের বাড়ির সবাই টিউবওয়েলের পানি পান করে। খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়। সবুজ আর সাথী বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসলো। পড়া শেষে দাদুর সাথে একত্রে খেতে বসলো। বাবা অন্য বাড়ী গেছেন।

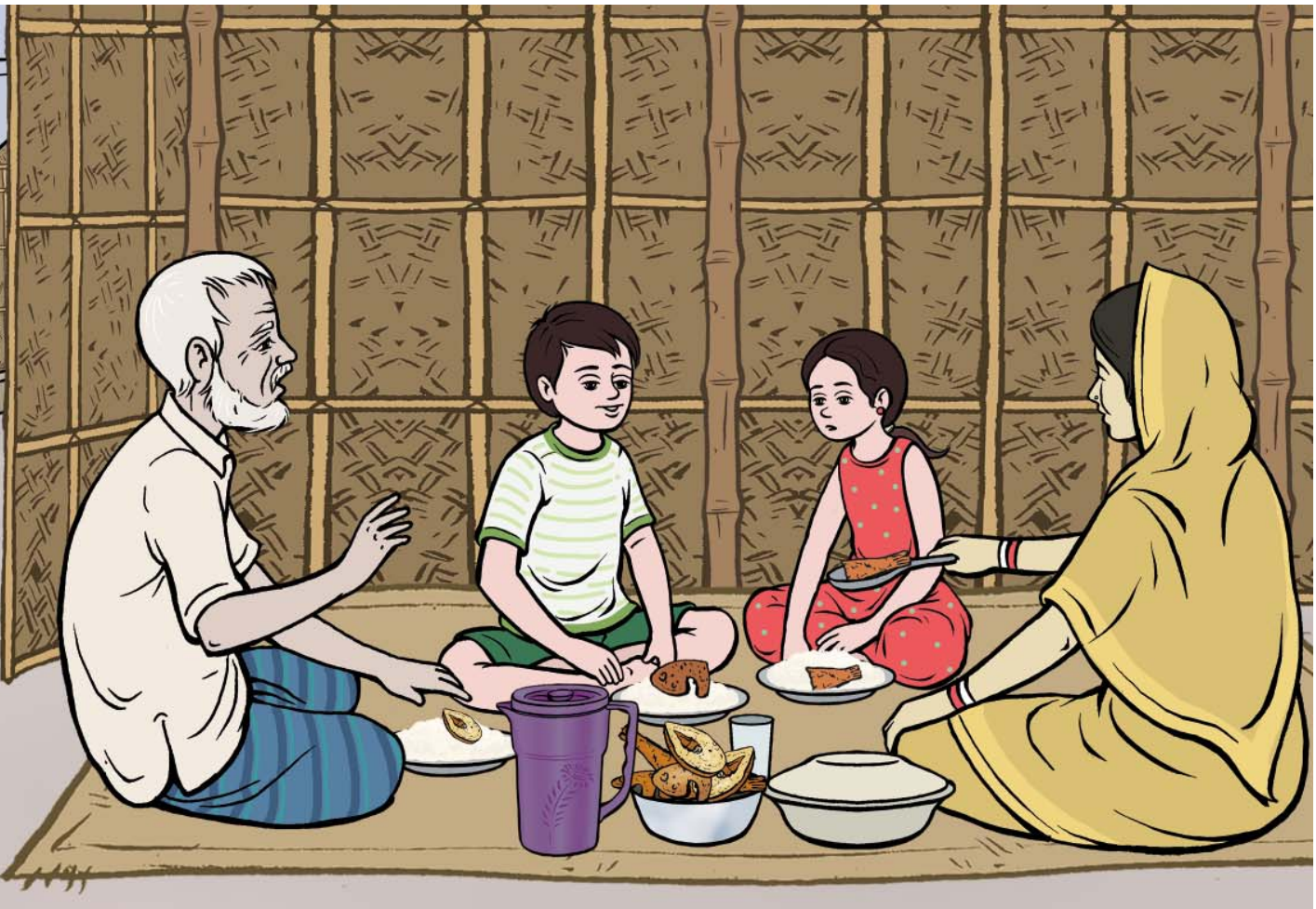

মা খাবার বেড়ে দেওয়ার সময় সবুজের প্লেটে একটি মাছের মাথা দিয়ে বললেন, ‘তোমাদের বাবা আজ বাজার থেকে ডিমওয়ালা উইজ্যা মাছ কিনে এনেছিলেন।’

কিন্তু মা সবুজকেই মাছের মাথাটা দিলেন কেন? সবুজ ছেলে বলে? দাদু বললেন, ‘শোন বৌমা, মাছের মাথাটা সবুজ ও সাথী দু’জনকে সমানভাবে ভাগ করে দাও। ওরা দু’জনই সমান এবং অনেক কষ্ট করেছে। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য না করে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে আমাদের।’

এরপর মাছের মাথাটা মা সবুজ আর সাথীকে ভাগ করে দিলেন।

খাওয়া শেষে সবুজ আর সাথী দাদুর সাথে এক ঘরে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লো। ঘুম ধরার আগে হাওড় নিয়ে দাদু তাঁদের বহু রকমের গল্প শোনালেন। গল্পের মাঝে বললেন, 'তোমরা দু'জন তোমাদের বাবাকে বলবে উইজ্যা মাছ ধরা প্রতিরোধ করতে ও বাজার থেকে উইজ্যা মাছ কেনা থেকে বিরত থাকতে, কেমন? উইজ্যা মাছ হলো ডিমওয়ালা মাছ। ডিমওয়ালা মাছ মারলে মাছের বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের টাংগুয়ার হাওড় ধীরে ধীরে মাছশূন্য হয়ে পড়বে এবং তোমরা ও তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষরা আর আজকের মতো স্বাদের মাছ খেতে পারবে না।'

সাথী জিজ্ঞেস করল, 'ভবিষ্যত প্রজন্ম কী দাদু?'

দাদু বললেন, 'আমাদের পরের আরও কতো মানুষ জন্মাবে পৃথিবীতে। তাঁরা হলো ভবিষ্যত প্রজন্ম। পরের এই মানুষদের জন্য পৃথিবীটাকে সুন্দর রেখে যাওয়াও মানুষের একটা কাজ।'

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল ভাই বোন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল তাঁরা তাঁদের বাবাকে অবৈধভাবে মাছ না ধরার কথা বুঝিয়ে বলছে এবং তাদের বাবা ও প্রতিবেশীরা অনেকে উইজ্যা ও অবৈধভাবে হাওড়ের মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছে। টাংগুয়ার হাওড়ের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, গাছ, নল, খাগড়া, পাখি, সাপ, কচ্ছপ, গিটগিটি, শাপলা, শালুক ইত্যাদি অনেক বেড়েছে। মোট কথা হাওড়ের জীববৈচিত্র্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। এতে তারা ও তাদের পরের মানুষরা অনেক প্রজাতির মাছ খেতে পাচ্ছে ও সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই হাঁস-মুরগির ডাক কানে এলো ভাইবোনের। টাংগুয়ার হাওড় সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে তাঁদের মা একটা খামার করেছেন। খামারের নিয়মিত পরিচর্যায় মাকে দুই ছেলেমেয়েও সহায়তা করে। তাঁদের ছোট সংসারের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বাবার পাশাপাশি মাও অনেক বড় ভূমিকা রাখেন।

পরের দিন স্কুলের সহপাঠীদের টাংগুয়ার হাওড় নিয়ে অনেক গল্প শুনালো সবুজ আর সাথী। পাখি, মাছ ধরা, মাছ চুরির শাস্তি, মেছো বাঘ নৌকা ভ্রমণ আরও কত কী! গল্প শুনে সহপাঠীরাও হাওড়ে ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করলো।

একদিন স্কুলে কয়েকজন হাওড়কর্মী ও গবেষক আসলেন। তাঁরা হাওড়ের জীববৈচিত্র্য নিয়ে ছেলে মেয়েদের অনেক তথ্য দিলেন। হাওড়কর্মীরা হাওড়ের উপর ভিডিও দেখালেন। সকলে তা দেখে মুগ্ধ হলো ও তাদের মনটা ভরে গেলো। টাংগুয়ার হাওড়ের উপর তাঁরা রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন।

‘টাংগুয়ার হাওড় সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প’ বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইইউসিএন এর সহযোগিতায় সহপাঠীরা স্কুলে গড়ে তুললো ‘টাংগুয়া প্রকৃতি সংঘ’ নামের একটি ক্লাব। টাংগুয়া হাওড়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা এই ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য এবং সবাই এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

‘টাংগুয়া প্রকৃতি সংঘ’ এর সব সদস্য মিলে একদিন হাওড় ভ্রমণে গেল। হাওড়ে তাঁরা অনেক জাতের হাজার হাজার পাখি দেখলো। এত পাখি একসাথে দেখলে চেনা খুবই মুশকিল। তাই এক শিক্ষকের সহযোগিতায় তারা পাখি দেখা শিখলো।

শিক্ষক বললেন, ‘পাখি দেখা শিখতে হলে সাথে রাখতে হবে বাইনোকুলার বা দূরবীন, নোটবুক, পেন্সিল ও পাখি চেনার বই। যে পাখি দেখবে তার গায়ের রঙ, আকার, পা, ঠোঁট ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা লিখে রাখতে হবে। তারপর পাখি চেনার বইয়ের সাথে মিলিয়ে পাখিটাকে সনাক্ত করতে হবে।’

প্রথমদিন এভাবেই তাঁরা পাখি চিনতে শুরু করলো। এক একটা পাখি সনাক্ত করছিলো আর যেন এক একটা বড় আবিষ্কার করলো। পাখি দেখায় যে এত আনন্দ তা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সারাদিন সবাই মিলে হাওড়ে ঘুরে অনেক জাতের পাখি ও উদ্ভিদ দেখলো। সবশেষে তাঁদের স্যার হাওড় ভ্রমণের উপর রচনা লিখতে বললেন।

এভাবেই সবুজ-সাথীর স্কুলে ‘টাংগুয়া প্রকৃতি সংঘ’ নামের স্বপ্নের সংগঠনটি গড়ে উঠলো। এর সদস্য হয়ে বন্ধুরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলো।

একদিন সবাই মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে বুঝালো যে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা যাবে না। মানুষকে তাঁরা জানালো যে, কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরলে ভবিষ্যতে তাঁরা আর কোন মাছই পাবে না।

এরপর থেকে তাঁরা নিয়মিত পাখি শিকারী, কচ্ছপ শিকারী, বন চোর ও মাছ চোরদের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করল এসব বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে আমরা হাওড়ের সব ধরনের সম্পদ হারাবো এবং আমাদের পরবর্তী বংশধররা এখনকার চেয়ে আরো অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে গাঁয়ের মানুষ তাঁদের কথা মেনে টাংগুয়ার সম্পদ রক্ষা করতে এগিয়ে এলো। তাঁরা পাখি শিকার, মাছ চুরি, বন বা গাছ চুরি, কচ্ছপ শিকার ইত্যাদি বন্ধ করলো। কারেন্ট জালসহ মাছ ধরার অন্যান্য নিষিদ্ধ উপকরণ পুড়িয়ে ফেলল। 'টাংগুয়া প্রকৃতি সংঘের' সদস্যরা আইইউসিএন এর কাছ থেকে তথ্য জেনে নিয়ে সম্পদের পরিমিত ব্যবহার ও তা মনিটরিং করার উপর দক্ষতা অর্জন করলো ও সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকলো।

সবুজ-সাথীর সংগঠন টাংগুয়া প্রকৃতি সংঘের আহ্বানে একদিন সবাই মিলে একটি দিনকে বিশেষভাবে উদযাপন করল। দিনটি ছিল 'বিশ্ব জলাভূমি দিবস'। এইদিন তাঁরা সকলে মিলে শপথ নিল টাংগুয়ার হাওড়ের এই জীববৈচিত্র্য ভরা জলাভূমি তাঁরা নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রক্ষা করবে।

‘টাংগুয়া পাড়ের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক চিত্রাঙ্কন’

চিত্রঃ টাংগুয়ার হাওড়ের পাখি

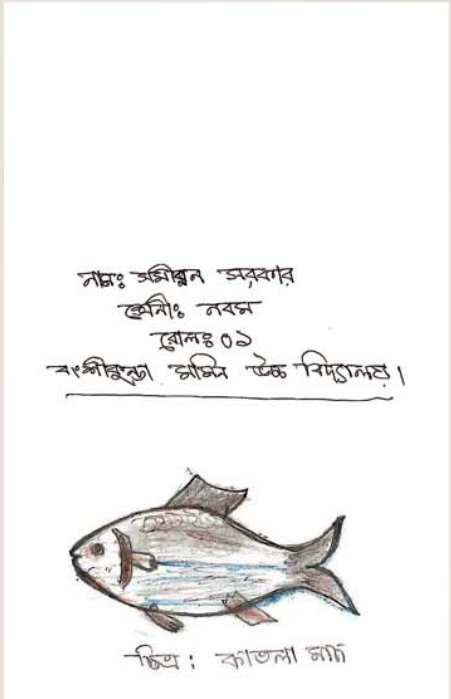

চিত্র : কাতলা মাছ

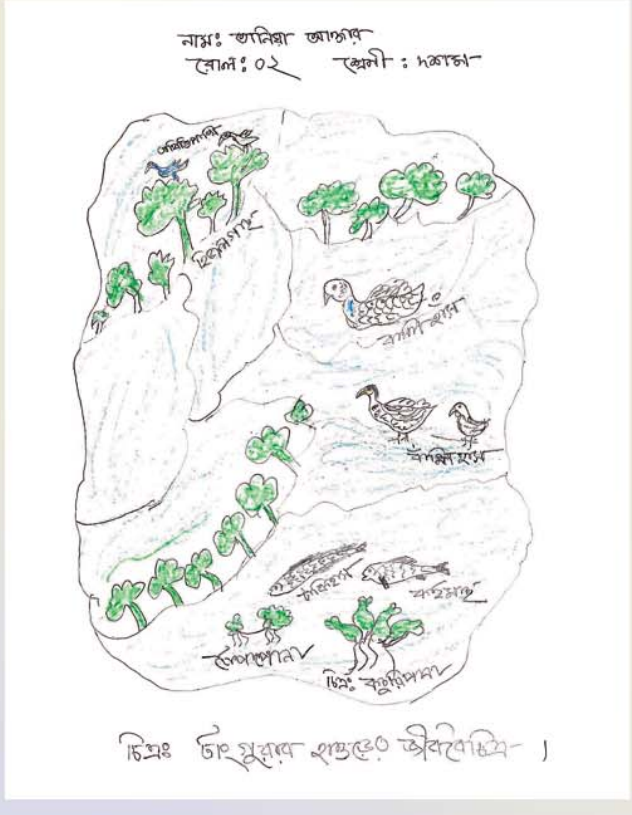

চিত্রঃ টাংগুয়ার হাওড়ের জীববৈচিত্র্য।

চিত্র: বক

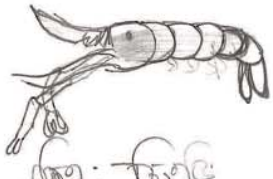

চিত্র: চিংড়ি

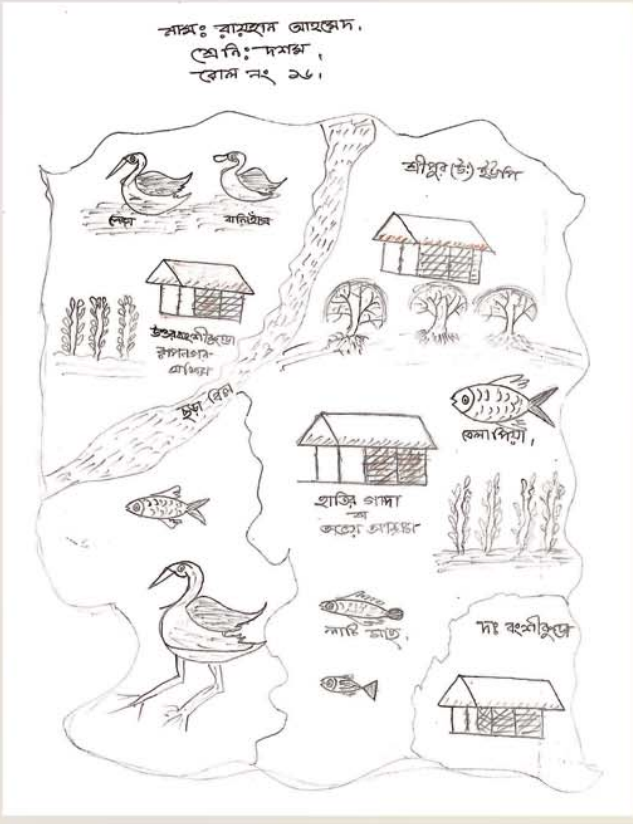
নামঃ রায়হান আহমেদ.
শ্রেনিঃ দশম,
রোল নং ২৬।
শ্রীপুর (উঃ) ইউপি
কেলাপিয়া,
হাতির গাদা
দঃ বংশীকুণ্ডা

শ্রেণী : দশম
রোলনং-০২
চিত্র : ০১
চিত্র : ০২ মাছ ধরছে।

আইনুল আহমদ
শ্রেনি ৬ষ্ঠ
রোল - ৯১

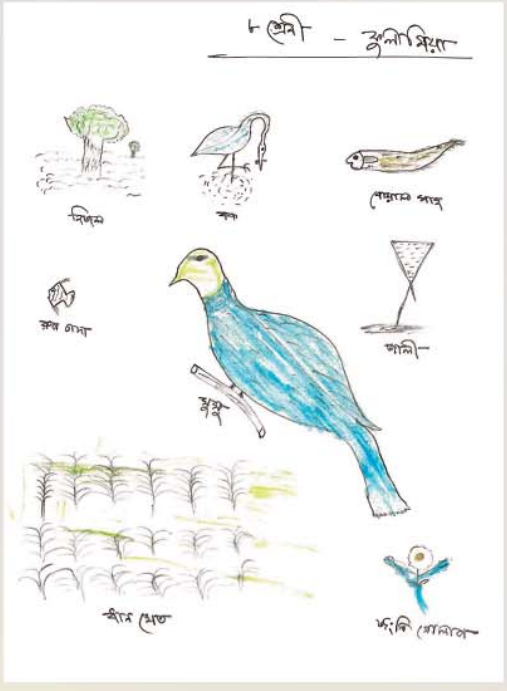
৮ শ্রেণী - তুলসিয়া

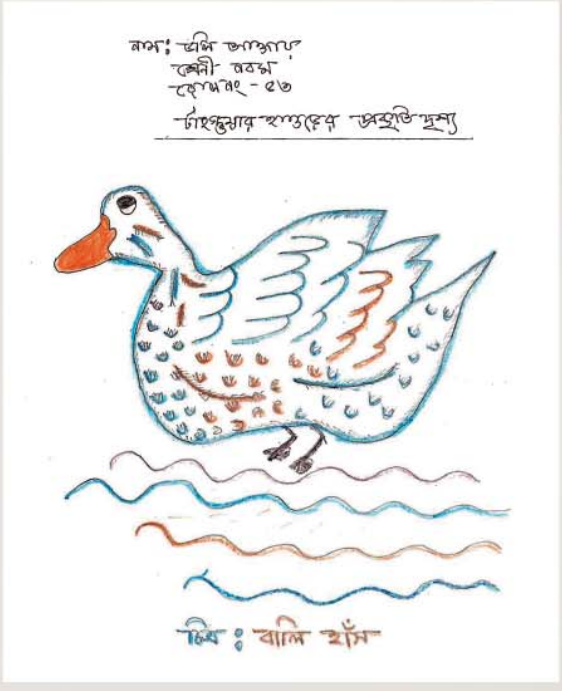
চিত্র : বালি হাঁস

মোঃ লাভলী আক্তার
বাগলী উচ্চ বিদ্যালয়
নবম শ্রেণী

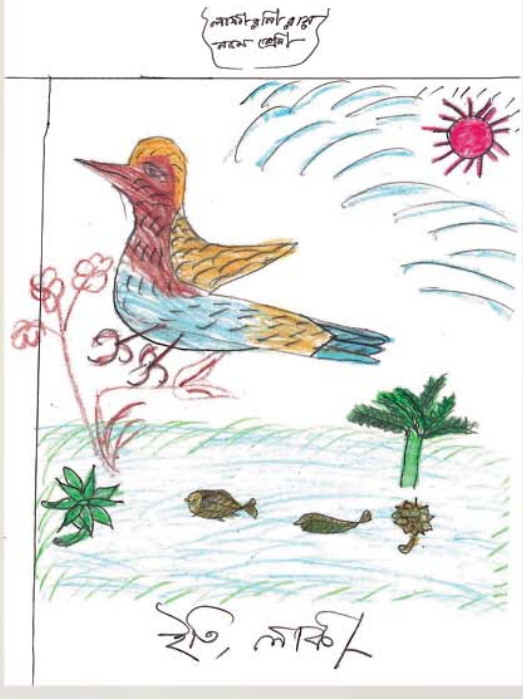
নবম শ্রেণী
ইতি, লাকী

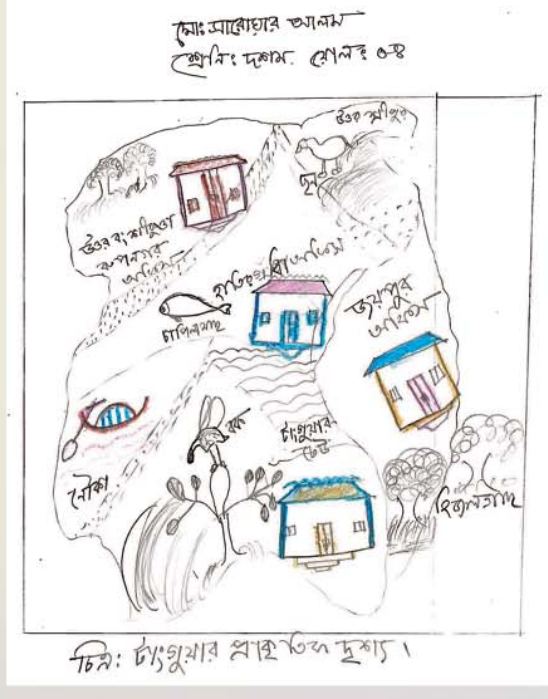
মোঃ সারোয়ার আলম
শ্রেণিঃ দশম. রোলঃ ০৪
উত্তর শ্রীপুর
উত্তর বাঃ শীতুতা
কম্পনগর
অফিস
হাতিরগাধা অফিস
চাপিলাগাছ
জয়পুর
অফিস
বক
টাংগুয়ার
ঢেউ
নৌকা
হিজলগাছ
চিত্র: টাংগুয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

বাগলী উচ্চবিদ্যালয়
মনির হোসেন
শ্রেণী - ৮ম
রোল নং - ১

* টাংগুয়া হাওড় পরিদর্শন।

* ২০১৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী মাসের বৃহঃ বার দিন বাগলী উচ্চবিদ্যালয় থেকে আমরা কতজন ছাত্র/ছাত্রী পরিদর্শকদের সাথে আমরা টাংগুয়া হাওড় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা সকলে একসাথে নৌকার উপর বসে এই হাওড়ের পশু-পাখি, গাছ-পালা ও তারপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এরপর চানাস্তা করে দূরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকপ্রজাতির হাঁস আমাদের চোখে পড়ে। দেশি মেটে হাঁস, পাতিভূতি হাঁস, মরচে রঙের ভূতি হাঁস এগুলো কয়েকটি হাঁস দেখলাম। মরচে রংএর হাঁসটি দেখতে আমার খুব সুন্দর লাগল। এর মধ্যে গাঙওয়ালের একটি পুরুষ হাঁস দেখলাম, এ হাসটির দুপাশে ধূসর রং ঠোঁট কালো। এগুলো সব পাখি। একটি পাখি দেখলাম, পানকৌড়ি তারনাম। এ পাখিটির গায়ের রং কালো। পানির তলায় ডুব দিয়ে খাবার খায়। আমি আরও একটি পাখি দেখলাম

(অপরপৃঃ)

তার নাম হচ্ছে কালেম। এই পাখিটির গায়ের রং নীল বর্ণের। ঠোঁট এবং মুখের দিকটা লাল রঙের। খুব সুন্দর লাগল পাখিটি দেখতে। এই পাখিগুলো নল খাগড়ার ভিতরে বাসা বাঁধে হাঁস গুলো পানির নিচ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, ছোট-বড় শামুক ও মাছ আহার করে। একটি পাখি দেখলাম গায়ের রং সাদা ঠোঁট কালো। এটিকে গাংচিল বলা হয়। পানির উপরে ভাসতে থাকে এবং পোকামাকর ও বিভিন্ন খাদ্য আহার করে। আমরা সফলেই শত-সহস্রাধিক পাখি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। পাখি গুলোর বাকে কত সুন্দর দেখায়। এই পাখির খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায়। তারা একটির উপর অরকটি নির্ভরশীল। যেমন পাখি গুলো যে আহার না থাকে ~~তাই~~ হলে এই পাখি গুলো এখানে আসবে না। কালেম যেমন বাসকরে নল খাগড়ায়। নল-খাগড়া না ~~থাকে~~ থাকলে কালেম পাখিগুলো এই হাওড়ে থাকবে না। তাই আমাদের পাখিকুল বাঁচানোর জন্য বনতৈরী করা দরকার। বেশি করে গাছ লাগানো দরকার। একটি পাখি হল কুড়া ঈগল। এটি বড় গাছের মগডালে বাসা বাঁধে। তাই বড় ধরনের গাছ না থাকলে এ পাখিটি এখানে আসবে না

আমরা টাংগুয়ার হাউড়ে কত গুলো ছাছ দেখতে পেলাম। করচ গাছ, নল খাগড়া, হিজল গাছ, পানির তলায় দেখলাম হাইডিলা; বড় বড় গাছ গুলো এই হাউড়ে বন সৃষ্টি করবে। তাই এই হাউড়ে বড় বড় গাছ লাগানো দরকার। এই হাউড়ের ভিতরের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদ গুলো বাচানো আমাদের সকলের কর্তব্য। এগুলো আমাদের দেশের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরী করবে, এমনকি পরিমিত ভাবে ভোগের সুবিধাও হবে। (আল্লাহ হাফেজ)

আইরিন আক্তার লিপি
বাগনী উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেনী অষ্টম, রোল - ৪

২০১৩ এর ২৪ জানুয়ারী আমরা কিছু ছাত্র ছাত্রী ভ্রমনে গিয়ে ছিলাম জায়গার নামটি হচ্ছে টাঙ্গুয়ার হাওর। সেখানে গিয়ে খুবি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের গ্রামের এত কাছে কত সুন্দর জায়গা। যা কখনো ভাবতেও পারিনি। সেখানে নানা ধরনের পাখ পাখালি দেখে আত্ম হারা হয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি জায়গাটি অনেক সুন্দর। আমরা নৌকায় ভ্রমণ করে ছিলাম। পানিতে চেয়ে দেখতে পেলাম যে অনেক হাই ড্রিলা। এই সব হাই ড্রিলা সকল ধরনের হাস খায়। হাসের মধ্যে একটি জাত ছিল গাউ ওফলী। গাউ ওফলি দুই ধরনের, ছেলে মেয়ে। এবং একটি মরচেং ভূতি হাস দেখতে পেলাম, এগুলো দুই ধরনের, পুরুষ স্ত্রী। গাউ ওফলের গায়ের রং ধুসব বাদামি। মরচেং এর ঠোঁট কালো, লেজ সাদা, পিঠের দিকের রং কালো, পেটের দিক দিয়ে সাদা। এবং পাতি ভূতি হাসের মাথা লাল ঠুঁট কালো, শরির সাদা।

এবং আর অনেক প্রজাতির পাখি দেখেছি আমরা। পান কৌড়ি। গায়ের রং কালো, কালেম যার গায়ের রং নীলপা লালচে। নল খাগরার ভিতরে কালেম বাস করে। এবং এর মধ্য থেকে পুকা মাকর খেয়ে বাচে। হটাত একটা সাদা পাখি দেখলাম, তার নাম গাং চিল। গায়ের রং সাদা, পানির উপর দিয়ে উড়ে। আর একটি পাখি দেখলাম, মোটি হচ্ছে লিটিল গ্রেপ, গায়ের রং লালচে সাদা। এবং একটি মজার পাখি দেখলাম যে মোটি, পানির উপর দিয়ে অনেক জায়গা যেতে পারে। পাখি

টির নাম লেনজে। দেখতে খুবি সুন্দর। আমরা
যারা ছিলাম তারা এই সব দেখে খুব মুগ্ধ
হয়েছিলাম। একটি পাখি হচ্ছে গুয়ার। আর
উপরি ভাগ সাদা, নিচের দিকে মেটে মাদা।
এই ছোট বড় অনেক প্রজাতির পাখি আমরা
দেখেছি। এই সব পাখি দেখতে অনেক সুন্দর।
এখানে একটি হাস পাতি হাসের মত লেগেছে।
পরে জানতে পারলাম যে, এটি দেশি মেটে
হাস। এগুলো খামের উপর এই পানিতে থাকে।

এখানে এসে প্রকৃতির লীলাভূমি দেখে আমার
মন ভরে গেছে। এখানে এসে মনে হচ্ছে
আমরা অন্ধকার জগতে পড়ে রয়েছি। আজ
যেন আলোকিত জগতে এসে পড়েছি।
চারিদিকে দিগন্ত বৃহত্তর সবুজের সমারোহ।
গাছে গাছে পাখি। চারিদিকে পানি আর
পানি মাঝখানে উচু ভূমি সেখানে
থেকে মানুষ প্রকৃতিকে দেখাশুনা করে।
পানির নিচে রয়েছে হাইড্রিলা সেগুলো খেয়ে
সকল ধরনের হাস বেচে থাকে।

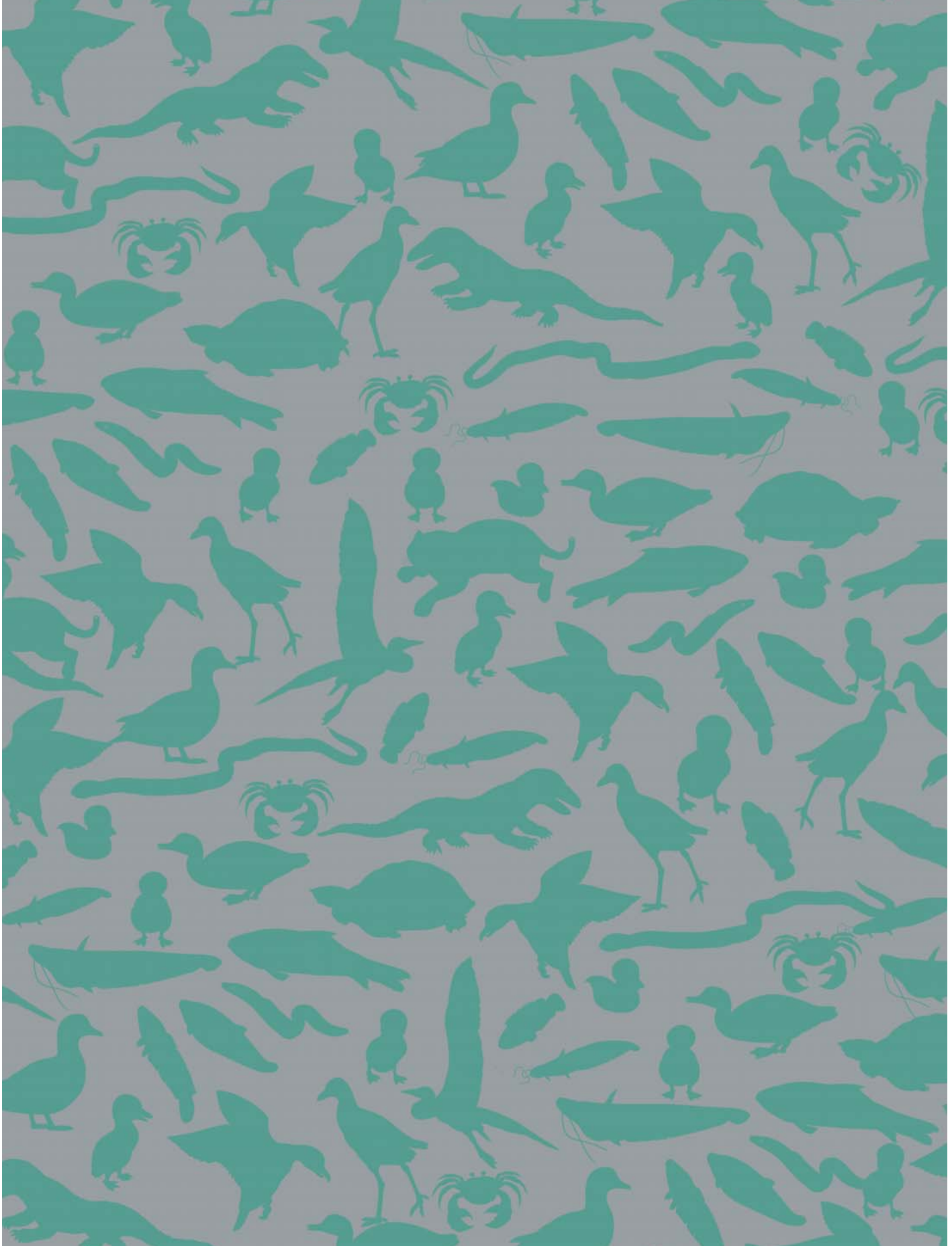

টাংগুয়ার হাওড় সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

সহযোগিতায় ঃ সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)